সাহিত্য পত্রিকা ॥ বাংলা বিভাগ ॥ তেতাল্লিশ বর্ষ ॥ দ্বিতীয় সংখ্যা ॥ ফাল্গুন ১৪০৬॥ ফেব্রুয়ারি ২০০০ (প্রকাশকাল : মে ২০০১)

বিশ শতকের তৃতীয় দশকে বাঙালি লেখকদের সাহিত্য-চিন্তা

রঘুনাথ ভট্টাচার্য*

বিশ শতকের তৃতীয় দশকটি বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় দেশে এবং বিদেশে সামাজিক ও রাজনৈতিক উত্থান-পতনের ফলে সাহিত্যক্ষেত্রেও তার প্রভাবে লেখকদের চিন্তা-চেতনায় পরিবর্তন সাধিত হয়। এ-দশকে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সাহিত্য-বিষয়ক নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির সন্ধান পাওয়া যায়:

১. অতুলচন্দ্র গুপ্ত, *কাব্যজিজ্ঞাসা* (১৩৩৫)
২. কাজী আবদুল ওদুদ, *নবপর্যায়,* প্রথম খণ্ড (১৩৩৩); দ্বিতীয় খণ্ড (১৩৩৬)
৩. চিত্তরঞ্জন দাশ, *কাব্যের কথা* (১৯২০)
৪. নলিনীকান্ত গুপ্ত, *সাহিত্যিকা* (১৯২০); রূপ ও রস (১৯২৮)
৫. প্রমথ চৌধুরী, *আমাদের শিক্ষা* (১৩২৭)
৬. যতীন্দ্রমোহন সিংহ, *সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা* (১৩২৮)
৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সংকলন* (১৩৩২)
৮. শশাঙ্কমোহন সেন, *মধুসূদন* (১৯২২); *বাণী-মন্দির* (১৯২৮)
৯. এস. ওয়াজেদ আলি, *মুসলমান ও বাঙ্গলা সাহিত্য* (১৩৩২)

বইগুলিতে সাহিত্যবিষয়ক কয়েকটি মৌল বিষয় আলোচিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে। সাহিত্যরচনার কৌশল, সাহিত্যের রসনিষ্পত্তি, জাতীয় জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক, সমাজ-জীবনে সাহিত্যের উপযোগিতা, কাব্যরচনার উপাদান, সাহিত্যের সমস্যা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নানা প্রসঙ্গে এসেছে।

দুই

যতীন্দ্রমোহন সিংহ কবিরঞ্জন (মৃ.-১৯৩৭)এর 'সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা' *সাহিত্য* পত্রিকার প্রসিদ্ধ সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির (১৮৭০ - ১৯২১) অনুরোধে রচিত হয়েছিল। বাংলা সাহিত্যের কয়েকজন বিখ্যাত ঔপন্যাসিকের কয়েকটি নামকরা উপন্যাস ব্যাখ্যা করে সেগুলি সমাজে কল্যাণ-না-অকল্যাণ বয়ে নিয়ে আসে তা তিনি নির্দেশ করতে চেয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৪), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৭৬ - ১৯৩৮) উপন্যাসে সধবা ও বিধবা নারীর প্রেম অঙ্কন করে তাঁরা হিন্দু সমাজবিগর্হিত কাজ করেছেন বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে :

---

* গবেষক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সৎ সাহিত্য আমাদিগের চতুঃপার্শ্বে একটা স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়া আমাদিগের মন সুস্থ রাখে। আবার তেমনি অসৎ সাহিত্য একটা দূষিত আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়া আমাদিগের নানা প্রকার মানসিক ব্যাধির উৎপাদন করে।[১]

লেখকের আপত্তির আরো একটি প্রধান কারণ যে, উপন্যাস-পাঠকের বড় অংশ অন্তঃপুরের মেয়েরা। তাঁর ভাষায়–

অধিকাংশ নবেল ও গল্পের বই আমাদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া সেখানে যে একটা অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার (Unhealthy atmosphereএর) সৃষ্টি করিতেছে– আমাদের সমাজে বায়ু দূষিত করিতেছে, ইহাই আমাদের প্রধান আপত্তির কারণ।[২]

প্রাচীন সাহিত্যের তুলনায় আধুনিক সাহিত্য পাঠকের মনকে মহৎ চিন্তা-চেতনার পরিপন্থী কাজে উৎসাহিত করছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসে বিধবার প্রেমের যে স্ফুরণ ঘটিয়েছেন, শরৎচন্দ্র তাতে পূর্ণাহুতি দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথই প্রথম দেবর–বৌদির প্রেম ঘটিয়ে পবিত্র স্নেহের অপব্যবহারপূর্বক সমাজে দূষিত আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছেন। শরৎচন্দ্র কিরণময়ী চরিত্রের মধ্য দিয়ে বারনারীর প্রেমের প্রসারতা ঘটিয়েছেন।[৩]

প্রাচীন সাহিত্যে বিবাহ-পূর্ব প্রেম ও বিধবার প্রেমকে স্বীকার করা হয় নি। বিয়ের পর স্বামী–স্ত্রীর প্রেম এবং বিধবার বিয়েকে সেকালের সাহিত্য স্বীকৃতি দিয়েছে। রামায়ণে বলির স্ত্রী তারার বা রাবণের স্ত্রী মন্দোদরীর তৎকালে প্রচলিত প্রথা অনুসারে পুনর্বার দেবরের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রই কুন্দনন্দিনীকে সৃষ্টি করে এর পথ দেখিয়েছেন।[৪] বিধবাদের প্রেম হিন্দু সমাজের আদর্শ অনুসারে ঘোরতর পাপের কাজ বলে তৎকালে পরিগণিত হতো। সে-সমাজ বিধবাদের দেবীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আধুনিককালে তাদেরকে সে-স্থান থেকে টেনে নামিয়ে সমাজের যথেষ্ট অপকার করা হয়েছে।[৫]

রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্র যে আর্টকে কেন্দ্র করে উপন্যাস রচনা করেছিলেন, তাঁদের সে আর্ট বাঙালি সমাজে নিষ্ফল হয়েছে। তাঁরা সমাজে পাপচিত্র বাড়িয়ে সমাজের আবহাওয়া দূষিত ও মানুষের মনকে রোগগ্রস্থ করে তুলেছেন।[৬] পাশ্চাত্যের অনেক লেখক তাঁদের সমাজকে সুস্থ ও সুন্দর করে তোলার জন্য সৎ সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। যদিও তাঁরা আর্টের চর্চা করেছেন, কিন্তু তাঁরা আর্টের অধীন থাকেন নি। তাঁদের পক্ষে মানুষকে সুশিক্ষা প্রদান করা সম্ভব হয়েছিল।

আর্ট কেবল সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠাই প্রদর্শন করে না, তা মানব হৃদয়ের উচ্চতম আকাঙ্ক্ষাকে জাগিয়ে তার পরিবর্তে চিত্তশুদ্ধির দিকে নিয়ে যায়। বর্তমান কালের বাঙালি সাহিত্যিকগণ তার পরিবর্তে আর্টকে কাজে লাগিয়ে মানুষের চিত্তবৃত্তিকে অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছেন। এহেন পরিস্থিতিতে তিনি লেখক-শিল্পীদের সৎ সাহিত্য সৃষ্টি করে মানুষের মনুষ্যত্ববোধের উদ্বোধন ঘটাতে পরামর্শ দিয়েছেন :

বাঙ্গালী জীবনের বাস্তব চিত্র অঙ্কন করিবেন, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীকে মনুষ্যত্ব লাভের পথ দেখাইবেন।[৭]

বাঙালি সমাজজীবনে প্রেম বিষের ন্যায় ক্রিয়া করে। পরকীয়া প্রেম কাব্য-সাহিত্যের দিক থেকে যদিও উৎকৃষ্ট উপাদান; কিন্তু সমাজ জীবনে এর প্রভাব ক্ষতিকারক। সমাজে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সৃষ্ট পরকিয়া প্রেমে বিভোর সৌদামিনীদের সংখ্যা বাড়ছে, কিন্তু দেব-চরিত্র ঘনশ্যামদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছেনা।[৮] শশাঙ্কমোহন সেন (১৮৭২-১৯২৮) *বাণী-মন্দির* গ্রন্থেও অনেকটা অনুরূপ ধারণা ব্যক্ত করেছেন। একালের সাহিত্য সত্য ও সুন্দরের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে ব্যভিচার ও যৌনবৃত্তির প্রসার ঘটাচ্ছে বলে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত :

> "Art for Art`s sake আদর্শে ব্যভিচারাত্মক প্রেমও আধুনিক কথাসাহিত্যের রসতন্ত্র রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়', 'চোখের বালি' ও 'ঘরে বাইরে' গল্পও ব্যভিচারাত্মক কামকেই প্রাধান্যতঃ আশ্রয় করিয়া আর্টের সৌন্দর্য্য চয়ন ও রসসিদ্ধি করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।[৯]

সাহিত্য-সাধনা সম্পর্কে তাঁর অত্যন্ত উচ্চ ধারণা ছিল। তিনি কু-সাহিত্য, সৎ-সাহিত্য ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন। কু-সাহিত্যের বিরুদ্ধে 'অগ্রণী ভূমিকা' নিতে তিনি সৎ-সাহিত্যিকদের কাছে আবেদন করেছিলেন।[১০]

তিন

জাতীয় জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক নিয়ে অনেক লেখক সেই সময়ে চিন্তা-ভাবনা করেছেন। শশাঙ্কমোহন সেন, চিত্তরঞ্জন দাশ (১৮৭০-১৯২৫) ও নলিনীকান্ত গুপ্তের (১৮৮৯-১৯৮৪) লেখায় এর প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। সাহিত্য জাতীয় জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে উঠলেই তার মধ্যে স্বদেশের অন্তরাত্মার ছবি পরিস্ফুট হয়। এক্ষেত্রে সাহিত্যিককে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তা উপলব্ধি করতে হয়।

> কাব্যে কবির অন্তরাত্মার ছবি সরলভাবে প্রতিফলিত হওয়া, সাহিত্য মাত্রেই জাতীয়-অন্তরাত্মার ছায়াবহ হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়।[১১]

এই মনোভাব চিত্তরঞ্জন দাশ ও নলিনীকান্ত গুপ্ত মেনে নিয়েছেন। *কাব্যের কথা* গ্রন্থে চিত্তরঞ্জন দাশ মূলত মধ্যযুগের বাংলা গীতিকবিতা তথা বৈষ্ণব পদ ও শাক্তপদ নিয়ে আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে, বাঙালির ঐতিহ্য ও জীবনধারার ওপর প্রতিষ্ঠিত বলেই সেগুলি সাহিত্য হিসেবে সফলতা অর্জন করেছে। তাঁর মতে, বৈষ্ণব সাহিত্যের ভেতরেই নিজের পরিচয়ের পাশাপাশি দেশের পরিচয় পাওয়া যায়। বৈষ্ণব কবিদের সাধনা ছিল প্রকৃতপক্ষে বাঙালির সাধনা। তাঁদের প্রত্যেকটি অনুভূতি হৃদয় ও প্রাণের অভিজ্ঞতার ওপরেই প্রতিষ্ঠিত। আত্মার সেই প্রেমরসের অনন্ত বিভূতি পরাধীনতার ভেতর থেকেই তাঁরা অর্জন করেছিলেন।[১২] বৈষ্ণব পদাবলীর সুরের ভেতর দিয়েই বাংলার অন্তরাত্মার প্রকাশ ঘটেছে। বাঙালি কবিদের লক্ষ করে আরেকজন সমালোচক বলেছেন–

> হে বাংলার কবি, এই সুরকে ভুলিও না, এইখানেই তোমার অন্তরাত্মা, বাংলার প্রাণ হইতেছে বৈষ্ণবের প্রাণ, তাহার সাহিত্যের মৌলিক সুর পদাবলীর সুর।[১৩]

চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি ও শ্রীচৈতন্য (১৪৮৫/৮৬-১৫৩৩) বাংলার পরিপূর্ণ রসমূর্তিটিকে নিজেদের জীবনের সাধনার দ্বারা স্বরূপে উপলব্ধি করেছিলেন। রামপ্রসাদের (১৭২০/৩০-১৭৮২) গান, নিধুবাবু

বা রামনিধি গুপ্তের (১৭৪১-১৮৩৯) টপ্পা, রামবসুর (১৭৮৬-১৮২৮) গানের ভেতর দিয়ে বাংলার ঘরের প্রাণের কথাই ফুটে উঠেছে। আধুনিককালে মধুসূদন (১৮২৪-১৮৭৩), বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-১৮৯৪) ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তারই প্রকাশ ঘটেছে। সাহিত্যের প্রধান কাজই জাতীয় আত্মাকে প্রবুদ্ধ করা। মানুষের মনকে সবল সচল সরাগ ও সমৃদ্ধ করার ভার সাহিত্যের ওপর ন্যস্ত। সাহিত্যচর্চা জাতীয় জীবন গঠনের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। এর মধ্য দিয়ে যা কিছু গড়ে ওঠে, তার মূলে থাকে জাতীয় আত্মা এবং জাতীয় কৃতিত্ব। শশাঙ্কমোহন সেনের মতে,

> সাহিত্য জাতিগঠনের এবং জাতীয় জীবনেরও প্রধান অবলম্বন; জাতির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা, রক্ষণ, ধারণ এবং পরিশোষণের মূল শক্তি সাহিত্যের হস্তেই আছে।[১৪]

চণ্ডীদাসের কাব্যের ভাব সর্বজনীন সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি কাব্যের ভেতর দিয়ে সকল মানবকে একই সূত্রে গাঁথার প্রয়াস পেয়েছেন। চণ্ডীদাসের অসমাপ্ত কাজ শ্রীচৈতন্য সমাপ্ত করেন। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে বাংলা গানে এক নতুন মাত্রা যোগ হয়ে তাকে আরো সর্বজনীন করে জীবন ও কর্মে মুখরিত করে তোলে। এতে মানব সমাজের কল্যাণ ও মঙ্গলের কথা বলা হয়েছে। বৈষ্ণব কবিদের সকল গানের সুধার ধারায় বাংলাদেশ ভেসে যায়। এরপর রামপ্রসাদ ও কবিওয়ালাদের গানে বাংলার পল্লি মুখরিত হয়ে উঠে। বিচিত্র ভাব, বিচিত্র সুর, বিচিত্র পদাবলী, ভাষাও ভাবের অপূর্ব সংমিশ্রণে বাংলায় আবার নতুন করে প্রাণের সঞ্চার হয়। এ সবের পূর্বে বিদেশি শাসন-শোষণে বাংলার বৈষ্ণবীয় জগৎ কিছুদিনের জন্য ম্লান হয়ে গিয়েছিল।
চিত্তরঞ্জন দাশ বলেছেন,

> বাঙ্গলায় প্রতীচ্যের নব আগমনে, তাহার আলোকে, তাহার বুকের সলিতা শুখাইয়া গেল, বাঙ্গলার দীপ নিভিয়া আসিল।[১৫]

মধুসূদনের *মেঘনাদবধ কাব্যের* ন্যায় *ব্রজাঙ্গনা* কাব্যের ভেতরেও বাঙালিত্বের প্রভাব রয়েছে এবং সেই সাথে বাংলার বৈষ্ণবীয় প্রকৃতির প্রভাবও বিদ্যমান আছে। তাঁর চতুর্দশপদী কবিতার মধ্যেও স্বদেশপ্রীতির লক্ষণ পরিস্ফুট হয়েছে।

চার

বাংলা সাহিত্যে চিন্তাপ্রধান এবং সাহিত্যধর্মী দু'ধরনের প্রবন্ধেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অসামান্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। আলোচ্য দশকে সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থ *সংকলন* (১৩৩২) প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়ও তাঁর সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির ক্রমতালিকা হলো:[১৬]

প্রকাশকাল		প্রবন্ধের নাম	আকর পত্রিকা
সন	মাস		
১৩৩১	বৈশাখ	সাহিত্য	*বঙ্গবাণী*
	ভাদ্র	*তথ্য ও সত্য*	*ঐ*
	কার্তিক	সৃষ্টি	*ঐ*
১৩৩৪	শ্রাবণ	সাহিত্য ধর্ম	বিচিত্রা

	অগ্রহায়ণ	সাহিত্যে নবত্ব	*প্রবাসী*
	ফাল্গুন	কবির অভিভাষণ	ঐ
১৩৩৫	বৈশাখ	সাহিত্যরূপ	ঐ
	জ্যৈষ্ঠ	সাহিত্য সমালোচনা	ঐ
১৩৩৬	কার্তিক	সাহিত্য বিচার	ঐ
	ফাল্গুন	পঞ্চাশোর্ধ্বম্‌	*বিচিত্রা*

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তার ধারাবাহিকতা প্রসঙ্গে বলা যায় যে, সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীতকে তিনি একই পরিধির মধ্যে এনে বলতে চেয়েছেন-এদের লক্ষ্য রূপের মাধ্যমে রসসৃষ্টি। সৃষ্টির সময় সাহিত্যিকের পারসোন্যালিটি সক্রিয় থাকে, ইনডিভিডুয়ালিটি। নয়। অর্থাৎ সংকীর্ণ ব্যক্তিসীমার ঊর্ধ্বে বৃহত্তর ব্যক্তিত্বে উত্তরণ করলেই কবির পক্ষে সার্থক সৃষ্টি সম্ভব। সাহিত্যরূপের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, রূপের ভিত্তিতে আছে 'বিষয়'। কিন্তু "বিষয় বিশুদ্ধ সাহিত্যের প্রাণ নহে।" তাই নতুন কিছু করার মোহে সাহিত্যে নির্বিচার বস্তুসঞ্চয়ের বিপক্ষে রবীন্দ্রনাথ।[১৭]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যচিন্তাকে কয়েকটি প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন। যেমন, 'সাহিত্য' 'কবির অভিভাষণ' 'তথ্য ও সত্য' 'সৃষ্টি' 'সাহিত্যধর্ম' 'সাহিত্যরূপ' ইত্যাদি। এসব রচনায় তাঁর সাহিত্যচিন্তার নানা পর্যায় ব্যাখ্যাত হয়েছে।[১৮] রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সীমা ও অসীমের সন্ধিতে দাঁড়িয়ে জীবনের রহস্যসন্ধানী, এবং সাহিত্যচিন্তার মধ্যে সেই রসের প্রকাশ তিনি ঘটাতে চেয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *সংকলন*-এ সাহিত্য বিষয়ক চারটি প্রবন্ধ রয়েছে : 'মেঘদূত'; 'শকুন্তলা'; 'ছেলে-ভুলানো ছড়া' ও 'রাজসিংহ'। প্রবন্ধসমূহে রবীন্দ্র সাহিত্যতত্ত্বের মূল প্রবণতা অনেকটা ধরা পড়েছে। তিনি আনন্দ ও সৌন্দর্যের তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন: সাহিত্য মানুষের মনকে অনন্তের দিকে নিয়ে যায় বলেও তাঁর ধারণা ছিল। সেই বিশ্বাসের ওপর দাঁড়িয়ে তিনি 'শকুন্তলা'; 'মেঘদূত'; 'রাজসিংহ প্রভৃতি প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁর ব্যাখ্যায় 'ছেলে-ভুলানো ছড়া'সহ চারটি প্রবন্ধই নতুন আলোক সম্পাতে দীপ্তিমান হয়ে উঠেছে।

কালিদাসের *মেঘদূত* কাব্যে মানুষের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির, তরুলতার, পশুপাখির একটা সহজ আত্মীয়তাবোধ, হৃদয়ের একটা গভীর সম্পর্ক অতি সহজেই স্থাপিত হয়েছে বলে তিনি লক্ষ করেছেন। আপন পরিবেশ-প্রকৃতির সঙ্গে মিলনেই মানুষের প্রিয় মিলনের সম্পূর্ণতা সাধিত হয়েছে। অনন্তের সঙ্গে মিলিত হওয়ার পথে পরিদৃশ্যমান জগৎ অন্তরায় হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন–

> আমরা যেন কোনো এক কালে একত্রে মানসলোকে ছিলাম, সেখান হইতে নির্বাসিত হইয়াছি। আবার হৃদয়ের মধ্যে এক হইবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু মাঝখানে বৃহৎ পৃথিবী।[১৯]

বিশ্বপ্রকৃতির প্রশান্ত ও সুন্দর মূর্তি *শকুন্তলা* নাটকে দৃশ্যমান, এতে কালিদাস শান্তি ও সৌন্দর্যকে কোথাও ক্ষুণ্ন করেন নি। শেক্সপীয়রের *টেম্পেস্ট* নাটকের মতো কালিদাস সম্ভোগের রাশকে আলগা না-করে তাকে সংযত করার প্রয়াস পেয়েছেন।[২০]

প্রাচীন ইতিহাস ও প্রাচীন স্মৃতির ক্ষুদ্রাংশ ছড়ার মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকে। কিন্তু এতে রসাস্বাদের কোন কমতি হয় না। উৎকর্ষের বিচারে যদিও এর গুরুত্ব কম; কিন্তু শিশুর মনোজগৎকে উদ্ভাসিত করতে ছড়ার গুরুত্ব অপরিসীম। 'ছেলে-ভুলানো ছড়া'য় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-

এই ছড়াগুলি মানসিক মেঘরাজ্যের লীলা, সেখানে সীমা বা আকার বা অধিকার নির্ণয় নাই।[২১]

আধুনিক ঔপনাসিকদের তুলনায় বঙ্কিমচন্দ্রের *রাজসিংহ* উপন্যাস অনেক বেশি প্রাণবন্ত ও অগ্রসরমান। এ উপন্যাস পাঠকের মনকে সহজে আকৃষ্ট করে পরিণামের দিকে টেনে নিয়ে যায়। কিন্তু কম প্রতিভা-সম্পন্ন লেখকের উপন্যাস শুরুতেই পাঠকের চিত্তকে বিভ্রান্ত করে। সত্যকে প্রকাশ করতে গিয়ে তাঁরা পাঠকের মাথায় জগতের ভার চাপিয়ে দেন। রবীন্দ্রনাথের মতে সাহিত্যের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে,

সাহিত্যে আমরা জগতের সত্য চাই, কিন্তু জগতের ভার চাহিনা।[২২]

একই সময়ে *সবুজপত্র* (১৯১৪) পত্রিকার মাধ্যমে প্রমথ চৌধুরী (১৮৮৬-১৯৪৬) গড়ে তুলেছিলেন বাংলা সাহিত্যের 'বীরবলী যুগ' ও 'বীরবলী চক্র'। তিনি রবীন্দ্রনাথের সর্বাশ্রয়ী ও সার্বভৌম প্রতিভা থেকে নিজেকে স্বতন্ত্ররূপে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি নিজের মনকে সাহিত্যের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। প্রাচীন কবির নব মূল্যায়ন, এ-যুগের মহাকবির পক্ষ সমর্থন, প্রতীচ্য সাহিত্যের গতিপ্রকৃতির বিশ্লেষণ, কিংবা সাহিত্যভাষা সম্বন্ধে মতামতজ্ঞাপন করাই তিনি যথেষ্ট মনে করেন নি, একইসঙ্গে সাহিত্যের আদর্শ ও উদ্দেশ্যও ব্যাখ্যা করেছেন।

প্রমথ চৌধুরী *সবুজপত্র* ছাড়াও *বিচিত্রা* , *মানসী ও মর্মবাণী* ও *মাসিক বসুমতী* পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছেন। রচনার তালিকা নিম্নরূপ :

প্রকাশকাল		প্রবন্ধের নাম	আকর পত্রিকা
সন	মাস		
১৩২৭	আষাঢ়	জয়দেব	*সবুজপত্র*
	ভাদ্র	কৈফিয়ত	ঐ
	আশ্বিন	রামমোহন রায়	ঐ
	কার্তিক	বাঙলার কথা	ঐ
১৩২৯	জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়	আমাদের ভাষাসংকট	ঐ
		সত্যেন্দ্রনাথ	
		আমাদের মতবিরোধ	
		দুখানি চিঠি	
১৩৩২	আশ্বিন	বীরবলের পত্র	ঐ
১৩৩৩	কার্তিক-অগ্রহায়ণ	সমালোচনা	ঐ
	পৌষ	কথা-সাহিত্য	ঐ
	মাঘ	অভিভাষণ	ঐ
	চৈত্র	বীরবল	ঐ

১৩৩৪	জ্যৈষ্ঠ–আষাঢ়	পূর্ব্ব ও পশ্চিম	ঐ
		বীরবলের পত্র	
	শ্রাবণ–ভাদ্র	রবীন্দ্রনাথ ও টম্‌সন	ঐ
		ফরাসী সাহিত্য	
	চৈত্র	চিত্রাঙ্গদা	*বিচিত্রা*
১৩৩৫	শ্রাবণ	ভারতচন্দ্র	*মানসী ও মর্মবাণী*
১৩৩৬	বৈশাখ	'কাব্যে' অশ্লীলতা: আলংকারিক মত	*মাসিক বসুমতী*

সাহিত্য প্রসঙ্গে 'সাহিত্যের সার্থকতা' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন–"যে উক্তির অন্তরে তার সকল ব্যক্ত স্পষ্টতার ভিতরেও একটা অব্যক্ত রহস্য ফুটে না-ওঠে তা সাহিত্য নয়। সাহিত্যের প্রধান কাজ হচ্ছে মানুষের মনকে তার সাংসারিক প্রয়োজনের গণ্ডির বাইরে নিয়ে যাওয়া, আত্মাকে অহং-এর হাত থেকে মুক্তি দেওয়া।"[২৪]

'সবুজপত্রের মুখপত্র' (*সবুজপত্র*, বৈশাখ ১৩২১), 'বীরবলের চিঠি'(ঐ), 'সাহিত্যের খেলা' (*সবুজপত্র*, শ্রাবণ ১৩২২), 'টীকা ও টিপ্পনি' (*সবুজপত্র* শ্রাবণ ১৩২৩), 'রূপের কথা' (*সবুজপত্র*, ফাল্গুন ১৩২৩.), 'সাহিত্যের সার্থকতা' (*সবুজপত্র*, বৈশাখ ১৩২৪) ইত্যাদি প্রবন্ধে সাহিত্যের আদর্শ ও উদ্দেশ্য প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে। 'সাহিত্যের খেলা' প্রবন্ধে সাহিত্যের উদ্দেশ্য কি নয়–এ যেমন তিনি বলেছেন, তেমনি সাহিত্যের উদ্দেশ্য কি তাও জানা যায়। তাঁর সিদ্ধান্ত হচ্ছে– সাহিত্যের উদ্দেশ্য মানুষের মনকে জড়তামুক্ত করা ও মানুষের মনকে জাগানো'; "কবির নিজের মনের পরিপূর্ণতা হতেই সাহিত্যের উৎপত্তি।"[২৫]

পাঁচ

লেখকের অন্তর্জীবনের ছাপ সাহিত্যের ভেতরে ফুটে ওঠে। এ মত শশাঙ্কমোহন সেন ও নলিনীকান্ত গুপ্ত সমর্থন করেছেন। প্রাচীন লেখকগণ বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সমাজ, দেশ ও মানুষকে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁরা ব্যক্তিগত জীবনে সৎ ও সুন্দরের পূজারী ছিলেন।

কাব্যের জগৎ হলো মায়ার জগৎ। সেজন্য কাব্যকে অন্তর্জীবন দিয়ে উপলব্ধি করতে হয়। কবিত্বের প্রথম কথাই হচ্ছে সকল রকম সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হওয়া। কবি খুঁজবেন বিশ্বভাব, বিশ্ববাক্-এমন ভাব যা জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে মানুষ মাত্রই অনুভব করতে পারে।[২৬] বিশ্ব ভাবকে বুঝতে হলে নিজের আত্মাকে ধরতে হবে। আত্মাই হচ্ছে বিশ্বের কেন্দ্র। আত্মাকে ধরতে পারলে বিশ্বকে সহজে আলিঙ্গন করা যায়। প্রাচীন সাহিত্যে এই বিশালতা ও সার্বভৌমিকতার নিদর্শন রয়েছে; দান্তে, হোমার, বাল্মীকি বা প্রাচীনতম বৈদিক ঋষিগণের রচনায় বিশ্ব সাহিত্যের সন্ধান পাওয়া যায়।[২৭] তাঁরা বৃহৎ সত্যকে অধিগত করে প্রাণ ও মনকে অজ্ঞানের কুপ্রভাব থেকে রক্ষা করে অমৃতের দুয়ারে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। অন্তরের সত্যকে তাঁরা অপরের কল্যাণ ও মঙ্গলের তরে ব্যয় করেছেন। তাঁরা বৃহৎকে সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[২৮]

কবিরা ভাবজগতের অধিবাসী; ভাবই তাঁদের জীবনের প্রধান উপজীব্য। তাঁরা ভাবুকতার শক্তি দেখিয়ে জগৎকে আকৃষ্ট করতে চান, সে জন্যই তাঁদের অন্তর্জীবনের দিকে মানুষের প্রধান দৃষ্টি। কবিদের অন্তর্জীবনকে বুঝতে পারলে তাঁদের রচিত সাহিত্যকেও বুঝা যায়। সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে শশাঙ্কমোহন সেন মধুসূদনের সাহিত্যকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন।

> কবিগণ নিজের অন্তরাত্মাকে কাব্যের মধ্যে পরের ভোগযোগ্য করিয়া প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন; আপনার ভাবনা এবং চিন্তাগুলিকে জগতের খাদ্যরূপে উপস্থিত করিতে পারেন; তাই কাব্য উপাদেয়। কিন্তু কাব্যপাঠের প্রকৃত রসবোধ বলিয়া যে জিনিষ, উহার সঙ্গে সঙ্গে কবিকে জানিতে পারিলে যেমনটি হয়, তেমন আর কিছুতেই হয় না।[২৯]

সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত জীবনের ভাল-মন্দের ওপরই নির্ভর করছে সৃষ্টির গুণাগুণ। আধুনিক বাংলা কাব্যের জগত বা অন্যান্য জগত প্রচারসর্বস্ব হয়ে পড়েছে। প্রাচীন সাহিত্যের প্রশান্ত সৌন্দর্যানুভূতি এখানে বিরল। সমাজের বিভিন্ন সমস্যার মীমাংসা ও আলোচনা এখন সাহিত্যের লক্ষ্য। অর্থাৎ, সাহিত্য এখন সুকুমার শিল্প না-হয়ে নীতি ও ধর্মশাস্ত্রে পরিণত হয়েছে; ভাববাদকে পরিহার করে বাস্তববাদকে পুঁজি করে আধুনিক কবিতার জন্ম। এতে দেশের বাহ্য জীবন ও কাজের সমস্যাগুলিই প্রকট হয়ে উঠছে।[৩০]

বর্তমান কালের সাহিত্যিকগণ জীবন ও জগৎকে নতুন দৃষ্টিতে দেখছেন। সে কারণে সাহিত্যের ভাষা, ভাব এবং আর্টকে বিচার করার মাপকাঠিও বদলে গেছে। প্রাচীন কাব্যশিল্প ছিল বস্তুর সুপরিস্ফুট প্রমূর্তিবাদী, আর আধুনিক শিল্প হয়েছে বিশেষভাবে বস্তুর সংকেতবাদী। সে কারণে প্রাচীন ও বর্তমানকালের সাহিত্যে ভাবগত পরিবর্তনটাই প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রকৃত সাহিত্যিক অন্তর্জীবনকে মুখ্যভাবে গ্রহণ করেন। সাহিত্য জগতের ক্ষেত্রে কবির ভাবময়-অন্তর্দেহ এবং বাণীক্ষেত্রে তার রূপায়ণটুকুই মুখ্য বিষয়। কবি নিজ অন্তরাত্মাকে কাব্যের মধ্যে অপরের ভোগযোগ্য করে প্রকাশ করতে চেষ্টা করেন; নিজ ভাবনা ও চিন্তাকে জগতের ভোগ্যরূপে উপস্থিত করেন। ভাব, বস্তু, রীতি ও অলংকারের যথাযথ সমবায়েই কাব্যের সৃষ্টি।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত *মেঘনাদবধ কাব্যে* বাংলার চিরার্জিত সংস্কারের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে তাঁর কাব্যের প্রতিষ্ঠা সিদ্ধি করেন। তাঁর সমগ্র কাব্য জুড়ে পাত্র-পাত্রীগণ অপরিহার্য দৈব দুঃখের মহাপাশে পড়ে কেবল ছট্‌ফট্‌ ও হা-হুতাশ করেছে। এর মধ্যে সংসারবাসী মনুষ্য-আত্মার চিরকালীন ক্রন্দনের সোদরত্ব এবং সমতা আছে। ভবজীবনের অপরিহার্য রোগ-শোক, দুঃখ-দুর্দশা এবং মৃত্যু পরাজয়ের মর্মগত প্রতিকৃতিটুকু আছে।[৩১] এতে মধুসূদনের শিল্পতা ও আদর্শের প্রতিফলন ঘটেছে। তাঁর কাব্যের পরিকল্পনা, ভাষা, ভাব ও বস্তুর পরিকল্পনা, প্রতিটি কাব্যশ্লোকে সাফল্য লাভ করেছে।[৩২]

রবীন্দ্রনাথের জগৎ হলো কল্পলোকের। তাঁর প্রাণের সূক্ষ্ম তন্ত্রী স্থূল জগৎকে এড়িয়ে সূক্ষ্মজগতে বিচরণ করেছে। তাঁর মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয়েছে অতীন্দ্রিয়ের অশরীরী জগৎ। সেজন্য কোন কিছুতেই তিনি তৃপ্ত হন নি। দৃষ্টির স্পষ্টতা কাব্যে ফুটে ওঠেনি। তাই তাঁর মধ্যে একটা অতিসন্তর্পণতা ও দ্বিধা বিদ্যমান। তাঁর উপলব্ধিজাত সত্য গভীর, সূক্ষ্ম ও উদার, কিন্তু তারপরও তাঁর মধ্যে সন্দেহের অস্পষ্টতা দূর হয় নি। এ প্রসঙ্গে নলিনীকান্ত গুপ্ত *সাহিত্যিকা* গ্রন্থে বলেছেন-

মানস জগৎ ছাড়াইয়া রবীন্দ্রনাথ দিয়াছেন তুরীয় জগৎ, কিন্তু তুরীয়েরও একটা মানসসত্তা আছে সেইটুকু রবীন্দ্রনাথ ধরিতে পারেন নাই- তিনি তুরীয়কে আলিঙ্গন করিতে চাহিয়াছেন কেবল ভাবুকতার আবেগে—তপঃশক্তির তীব্র লেখায় তাহাকে জাজ্বল্যমান করিয়া ধরিতে চান নাই।[৩৩]

ছয়

কবিতাসৃষ্টির কৌশল নিয়ে আলোচনা করেছেন নলিনীকান্ত গুপ্ত। তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে চারটি রীতি লক্ষ করেছেন : শব্দরীতি বা গৌড়ী রীতি, রোমান্টিক বা রাগাত্মক রীতি, ক্লাসিকাল বা অর্থাত্মক রীতি এবং ভাবাত্মক বা আত্মিক রীতি। এ সকল রীতি অবলম্বন করে কবিতা রচিত হয়। নলিনীকান্ত গুপ্ত চারটি রীতির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন; শব্দের ঝংকার, বাক্‌চাতুর্য, অলংকার, অনুপ্রাস প্রভৃতির সমন্বয়ে শব্দরীতি বা গৌড়ীরীতির কবিতার সৃষ্টি। এ রীতির কবিকে শব্দ কবি বলা হয়। কবি শব্দরীতিকে অতিক্রম করে আরেক ধাপ ওপরে উঠে ছন্দের ব্যঞ্জনার ভেতর দিয়ে কবিতায় রসবোধের সঞ্চার করেন। সেই শ্রেণীর কবিকে রস-কবি বলা যায়। রোমান্টিক বা রাগাত্মক রীতিই এঁদের আদর্শ। তাঁরা এক্ষেত্রে শব্দের মধ্যে রসের ধারা বইয়ে দেন। ক্লাসিকাল বা অর্থাত্মক রীতির কবিরা স্পষ্ট চিন্তাকে বিশেষ অর্থে প্রকট করে কবিতাকে অর্থগম্ভীর করে তোলেন। এতে বিষয়, বক্তব্য, বস্তু-নির্দেশ প্রাধান্য লাভ করে। এঁদের দার্শনিক কবি বলা হয়। সর্বশেষ স্তরের কবিরা তুরীয় মার্গে বিচরণ করেন। এক্ষেত্রে কবিরা ভাবলোকে বিচরণ করে আত্মসন্ধানে ব্যাপৃত থাকেন। শিল্পী এ স্তরে এসে হয়েছেন ঋষি। ভাবাত্মকতা আত্মিক রীতির কবিতাকে মিস্‌টিক কবিতাও বলা যেতে পারে।[৩৪]

কাব্যজিজ্ঞাসা গ্রন্থে অতুলচন্দ্র গুপ্ত (১৮৮৪-১৯৬১) কাব্যের চারটি লক্ষণের কথা বলেছেন : ধ্বনি, রস, কথা এবং ফললাভ। প্রাচীন আলংকারিকদের বিচারে রসকেই কাব্যের আত্মা হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। গ্রন্থকারের মতে, এর চেয়ে খাঁটি কথা কোনো কালে কেউ বলেনি।[৩৫] কবির কাজ পাঠকের চিত্তে রসের উদ্বোধন ঘটানো।[৩৬] এভাবেই কবি কাব্য সৃষ্টির মধ্য দিয়ে পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার মিলন ঘটাতে সক্ষম হন। মানব মনের আনন্দঘন রসের মধ্যেই লুক্কায়িত থাকে পরমাত্মার স্বরূপ।

সাত

এস. ওয়াজেদ আলি (১৮৯০-১৯৫১) ও কাজী আবদুল ওদুদের (১৮৯৪-১৯৭০) মতে, সাহিত্যক্ষেত্রে বাঙালি মুসলমানদের পিছিয়ে থাকার অন্যতম কারণ মাতৃভাষার প্রতি অনীহা। মানসিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী হওয়ায় তাঁদের সাহিত্য যুগোপযোগী না—হয়ে প্রাণহীন, আড়ষ্ট এবং জড় ভাবাপন্ন হয়ে পড়েছে। বাংলা ভাষা চর্চার মধ্য দিয়ে সাহিত্য চর্চার ধারাকে জাতীয় সাহিত্যের সৃষ্টিতে প্রবাহিত করা প্রয়োজন। তবেই জাতির কল্যাণ সাধন সম্ভব।[৩৭]

অতীতের মুসলমান সমালোচক ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্যের বিচার করেছেন। ফলে সমাজে বাংলা ভাষার চর্চা তেমনভাবে বিকাশ লাভ করে নি। আরবি ভাষার প্রতি মোহ জন্মাবার

কারণে বাঙালির চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা তৈরি হয়েছে। 'বাঙালী মুসলমানের সাহিত্য সমস্যা' প্রবন্ধে কাজী আবদুল ওদুদ বলেছেন-

> চিন্তার ক্ষেত্রে আমাদের দৃঢ়কণ্ঠে বলে দিয়েছে, তোমাদের সমস্ত চিন্তা সব সময়ে যেন সীমাবদ্ধ থাকে কোরআন ও হাদিসের চিন্তার দ্বারা।[৩৮]

সমকালীন উচ্চবিত্ত মুসলমান আরবি-ফার্সির চর্চা করতেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁদের বিদ্বেষ ছিল প্রচণ্ড রকমের। তাঁরা বাংলা ভাষাকে বিজাতীয় ভাষা হিসেবে গণ্য করতেন। কিন্তু সাধারণ মুসলমান সমাজের মধ্যে মাতৃভাষার চর্চা প্রচলন থাকায় সে সময়ে সাহিত্যের একটা দিক বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ধর্মান্ধ আলেম সমাজ শাস্ত্রের ভয় দেখিয়ে সাধারণ মানুষকে এ থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করে।[৩৯]

আধুনিক সাহিত্যের ভেতরে রয়েছে মানব জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলার অমোঘ শক্তি। এ সাহিত্য ব্যক্তি-জীবন, সমাজ-জীবন, রাষ্ট্রীয়-জীবন ও আধ্যাত্মিক-জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে চেষ্টিত। সাহিত্যচর্চার মাধ্যমেই সাহিত্যিকগণ আত্মবিকাশের পাশাপাশি দেশের ভাব-মূর্তিকেও উজ্জ্বল করে তুলতে পারেন।

প্রতিভাধর লেখক নিজ-নিজ প্রতিভা বলে দেশকে পৃথিবীর মাঝে নতুন করে পরিচয় করে দেন। ফার্সি সাহিত্যে কবি ফেরদৌসী (৯৩৭-১০২০ খ্রীষ্টাব্দ) তাঁর সাহিত্যকর্মের ভেতর দিয়ে পারস্যকে নতুনভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন।

> ফারসী ছিল শিশু, আধো আধো তার বোল, পলকে সেই হয়ে উঠ্‌ল জওয়ান! আর সে জওয়ানীও যে-সে জওয়ানী নয়-রোস্তমের পাহলোয়ানীর যোগ্য!

লিখেছেন কাজী আবদুল ওদুদ।[৪০] তিনিও বাংলা সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে বাঙালি মুসলমানকে জেগে ওঠার আবেদন করেছেন।

আট

বিশ শতকের তৃতীয় দশকের সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলোতে সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা, সাহিত্যের সঙ্গে জাতীয় জীবনের সম্পর্ক, লেখকের অন্তর্জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে সাহিত্যের ব্যাখ্যা, কাব্যরচনার উপাদান, সমাজ জীবনে সাহিত্যের উপযোগিতা, সাহিত্য সমস্যা ইত্যাদি প্রসঙ্গের আলোচনা করা হয়েছে। সাহিত্য সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ আটটি প্রবন্ধগ্রন্থ এই দশকে রচিত হয়েছিল। তাছাড়া অন্যান্য বইয়েও সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ রয়েছে।

সাহিত্যের কাজ হলো সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষা করা। সৎ বা ভাল সাহিত্যই তা করতে সক্ষম। *সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা* ও *বাণী-মন্দির* গ্রন্থে সমাজ জীবনে সৎ ও অসৎ সাহিত্যের প্রভাব কী ভাবে প্রতিফলিত হয় তা বর্ণিত হয়েছে। প্রাচীন সাহিত্যের তুলনায় আধুনিক গল্প-উপন্যাস মানুষের সুস্থ জীবনের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। এতে করে সমাজ জীবন কলুষিত হয়ে উঠেছে।

সাহিত্যের সঙ্গে জাতীয় জীবনের সম্পর্ক অপরিসীম। সাহিত্যের ভেতর দিয়ে বাঙালি জাতির ঐতিহ্যের পাশাপাশি দেশের পরিচয়ও ফুটে ওঠে। শশাঙ্কমোহন সেনের *মধুসূদন*, নলিনীকান্ত গুপ্তের *সাহিত্যিকা*; চিত্তরঞ্জন দাশের *কাব্যের কথা* গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, প্রাচীন বৈষ্ণব সাহিত্যের ভেতরেই বাংলার অন্তরাত্মার প্রকাশ ঘটেছে। বৈষ্ণব কবিদের সাধনা ছিল প্রকৃতপক্ষে বাঙালির সাধনা। বৈষ্ণব

কবিদের পাশাপাশি শাক্তপদাবলী ও কবিওয়ালাদের গানেও বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের উদ্বোধন ঘটেছে।

লেখকের অন্তর্জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে সাহিত্যকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব বলে শশাঙ্কমোহন সেন ও নলিনীকান্ত গুপ্ত মনে করেন। *সাহিত্যিকা; রূপ ও রস;* ও *মধুসূদন* গ্রন্থে তাঁরা দেখিয়েছেন যে, প্রাচীন লেখকগণ শব্দ ও সুন্দরের পূজারী ছিলেন। লেখকেরা কবির অন্তর্জীবনের আলোকে সাহিত্যসাধনা ব্যাখ্যা করেছেন। কবিদের অন্তরাত্মার ছবি তাঁদের সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়। কবিদের অন্তর্জীবনকে বুঝতে পারলে তাঁদের কাব্য-সাহিত্যকেও বুঝা যায়।

এ সময়ে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো রসতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করা। পাঠকের চিত্তে রসের উদ্বোধন ঘটানোই লেখকের বড় দায়িত্ব বলে তাঁরা মনে করছেন। শব্দের ঝংকার, ছন্দের ব্যঞ্জনা, অলংকারের কারুকার্য ও ধ্বনিময়তার মধ্য দিয়ে মানব হৃদয়কে আন্দোলিত করে তোলাই হলো প্রকৃত কবির সাধনা। এর মধ্য দিয়েই পাঠক কাব্য পাঠ করে আনন্দ পায় এবং পরমাত্মার সঙ্গে মিলনের আনন্দ অনুভব করে। অতুলচন্দ্র গুপ্তের *কাব্যজিজ্ঞাসা* ও নলিনীকান্ত গুপ্তের *রূপ ও রস* পুস্তকে এই তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা লক্ষণীয়। অতুলচন্দ্র গুপ্তের মতে :

"কাব্য সম্বন্ধে তার চেয়ে খাঁটি কথা কোনো দেশে, কোনো কালে, আর কেউ বলেনি।[৪১]

প্রাচীন কাব্য মানুষের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির সংযোগ স্থাপন করে। বিশ্বপ্রকৃতির প্রশান্ত ও সুন্দর মূর্তি কাব্যের আঙ্গিক সৌন্দর্যকে পরিস্ফুট করে তোলতে প্রয়াস পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'মেঘদূত' ও 'শকুন্তলা' প্রবন্ধে কালিদাসের কাব্য-নাটকের শাশ্বত সৌন্দর্যকে তুলে ধরেছেন। আধুনিক সাহিত্যে কালিদাসের কালকে কোনক্রমেই ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। 'ছেলে-ভুলানো ছড়া'য় লেখক বলতে চেয়েছেন যে, ছড়ার মধ্য দিয়ে শিশুর মনোজগৎ উদ্ভাসিত হয়। 'রাজসিংহ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ দেখাতে চেয়েছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের প্রাণবন্ততা আধুনিক ঔপন্যাসিকদের তুলনায় অনেক বেশি।

অতীতে বাঙালি মুসলমানের জীবনে সাহিত্য চর্চা তেমনভাবে বিকাশ লাভ করেনি। এর পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ হলো, মাতৃভাষার প্রতি তাঁদের অনীহা। তাঁরা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্যের বিচার করেছেন। এস. ওয়াজেদ আলির 'মুসলমান ও বাঙ্গলা সাহিত্য'; কাজী আবদুল ওদুদের 'বাঙালী মুসলমানের সাহিত্য সমস্যা' ও 'সাহিত্যে সমস্যা' প্রবন্ধে মুসলমানদের বাংলা ভাষার প্রতি অনীহা ও সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে অনগ্রসরতার পাশাপাশি এ অবস্থা থেকে উত্তরণ সম্পর্কেও বলা হয়েছে। সাহিত্যই একটি জাতিকে বিশ্বের দরবারে পরিচয় ঘটিয়ে দিতে সক্ষম।

তথ্যনির্দেশ

১. যতীন্দ্রমোহন সিংহ, *সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা* (কলকাতা : ভট্টাচার্য্য এন্ড সন্, ১৩২৮), পৃ ৩

২. ঐ, পৃ ১১

৩. ঐ, পৃ ৯৯

৪. ঐ, পৃ ১৫

৫. ঐ, পৃ ৩০

৬. ঐ, পৃ ৭৪

৭. ঐ, পৃ ১১৯

৮. ঐ, পৃ ৬৮

৯. শশাঙ্কমোহন সেন, *বাণী-মন্দির,* (কলকাতা : ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯২৮), পৃ ৫৪৮

১০. ঐ, পৃ ৫৯০

১১. শশাঙ্কমোহন সেন, *মধুসূদন,* অধ্যাপক প্রতাপ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, (কলকাতা : এ, মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিঃ, ১৯৫৯), পৃ ২৩

১২. চিত্তরঞ্জন দাশ, *কাব্যের কথা,* (কলকাতা : ইন্ডিয়ান বুক ক্লাব, ১৯২০), পৃ ৭৯

১৩. সাহিত্যিকা, *নলিনীকান্ত গুপ্ত রচনাবলী,* প্রথম খণ্ড, (কলকাতা : শৃণ্বন্তু, ১৯৭৫), পৃ ১৫

১৪. *বাণী-মন্দির,* পূর্বোক্ত, পৃ ৭০০

১৫. *কাব্যের কথা*, পূর্বোক্ত, পৃ ৬৭

১৬. সুদীপ বসু, *বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার ধারা,* (কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ১৯৯৭), পৃ ৪০-৪১

১৭. ঐ, পৃ ৬৫

১৮. ঐ, পৃ ৬৫

১৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মেঘদূত, *সংকলন* : (কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৩৮৬), পৃ ৮৫

২০. শকুন্তলা, *সংকলন* : ঐ, পৃ ৯৮

২১. ছেলে-ভুলানো ছড়া, *সংকলন* : ঐ, পৃ ১০৯

২২. রাজসিংহ, *সংকলন* : ঐ, পৃ ১৩৩

২৩. *বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার ধারা,* পূর্বোক্ত, পৃ ৮৩

২৪. সাহিত্যের সার্থকতা, সবুজপত্র, প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত, (কলকাতা, বৈশাখ,১৩২৪), পৃ ১২

২৫. *বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার ধারা,* পূর্বোক্ত, পৃ ৯১-৯২

২৬. *সাহিত্যিকা,* পূর্বোক্ত, পৃ ২৩

২৭. ঐ, পৃ ৩১

২৮. রূপ ও রস, *নলিনীকান্ত গুপ্ত রচনাবলী,* প্রথম খণ্ড, (কলকাতা, শৃণ্বণ্ড, ১৯৭৫), পৃ ১৩৮

২৯. *মধুসূদন,* পূর্বোক্ত, পৃ ৭

৩০. *রূপ ও রস,* পূর্বোক্ত, পৃ ১৪৫-১৪৬

৩১. *মধুসূদন,* পূর্বোক্ত, পৃ ১১৬-১১৭

৩২. ঐ, পৃ ১১৮

৩৩. *সাহিত্যিকা,* পূর্বোক্ত, পৃ ১৩

৩৪. রূপ ও রস, পূর্বোক্ত, পৃ ১২৮-১৩০

৩৫. অতুলচন্দ্র গুপ্ত, *কাব্যজিজ্ঞাসা* (কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৪০৩), পৃ ২৩

৩৬. ঐ, পৃ ৪৬

৩৭. 'মুসলমান ও বাঙ্গলা সাহিত্য', সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পাদিত, *এস, ওয়াজেদ আলি রচনাবলী,* প্রথম খণ্ড, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), পৃ ৪৬-৪৭

৩৮. 'নবপর্যায় : বাঙালী মুসলমানের সাহিত্য সমস্যা', দ্বিতীয় খন্ড, *শাশ্বত বঙ্গ,* (ঢাকা : ব্র্যাক প্রকাশনা, ১৯৮৩), পৃ ৩২৪

৩৯. ঐ, পৃ ৩২৬

৪০. 'নবপর্যায় : সাহিত্যে সমস্যা', শাশ্বত বঙ্গ প্রথম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ ৩৭৪

৪১. *কাব্য জিজ্ঞাসা,* পূর্বোক্ত, পৃ ২৩